সংসারে ঝড় ঝড়ের সংসার

আফরোজা অদিতি

আজকাল পত্রিকা খুললেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সমাজে পারিবারিকভাবে মেয়েরা অধিক নির্যাতিত হচ্ছে। স্বামী, স্বামীর আত্মীয় এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের দ্বারা সহিংস নির্যাতনের কথাও পত্রিকায় দেখা যায়। কখনো খবর পাওয়া যায় স্ত্রীর গায়ে আগুন দেওয়া হয়েছে, কখনো কারো চোখ তুলে নেওয়া হয়েছে, কখনো খুন করা হয়েছে। অমানবিক ঘটনা ঘটেই চলেছে। এটা জানা কথা যে, স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন অন্যদের কানে আসে না। ভেতরের কথা কখনো জানা যায় কখনো যায় না। নির্যাতনের মাত্রা বেশি হলে তবেই জানাজানি হয়, না হলে গোপনই থেকে যায়। স্ত্রী সে কথা গোপনই রাখে।

পারিবারিক নির্যাতন বিষয়ে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের এক জরিপে দেখা গেছে, ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্বামীর হাতে সহিংসতার শিকার ২৯২ জন। সহিংসতায় ১৬৭ জন নারী মারা গেছে। ২০১৪ সালে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৪৮৮ জন নারী। এই সময়ে স্বামী কর্তৃক হত্যার শিকার হয়েছে ২৬২ জন। যৌতুক, সন্দেহ, পারিবারিক কলহ থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে এই সহিংসতা। পারিবারের অভ্যন্তরে নারীর ওপর সহিংস আচরণ করে তার স্বামী। কখনো স্বামীর সঙ্গে শ্বশুর, শাশুড়ি, দেবরও যোগ দেয়। অবিবাহিত কোনো ননদ থাকলে সেও যোগ দেয়। শ্বশুরবাড়িতে একজন স্ত্রীর সবচেয়ে কাছের জন হলো তার স্বামী। এই স্বামীই যদি হন্তারক, নির্যাতক হয় তবে মেয়েটি যাবে কোথায়?

যখন একজন ছেলে ও একজন মেয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়, তখন এক একে দুই নয় বরং তারা একে একে এক হয়ে যায়। আমাদের সমাজ চলতি নিয়ম অনুসারে বিয়ের পরে ছেলে কখনো শ্বশুরবাড়ি থাকে না। শ্বশুরবাড়ি থাকতে হয় মেয়েকে। ছেলেরা বিয়ে করে একটা মেয়েকে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসে। মেয়েরা নতুন জীবনে প্রবেশ করে এবং নতুন পরিবেশে আসে। যেমন কোনো একটি গাছের চারা এক মাটি থেকে তুলে অন্য এক মাটিতে নতুন আবহাওয়ায় প্রোথিত করা হয় এও অনেকটা তেমনি। সম্পূর্ণ নতুন জীবন ও নতুন পরিবেশের সঙ্গে মেয়েদের অ্যাডজাস্ট করে নিতে হয়। একটা মেয়ে বাবা-মায়ের কাছে যে আদরে-আবদারে বড়ো হয়েছে, শ্বশুরবাড়ি এসে ঠিক ওই পরিবেশটা সে না-ও পেতে পেরে। তার রুচি ও মানসিকতার মিল এখানে না-ও ঘটতে পারে। এতে মেয়েটার অ্যাডজাস্ট করতে একটু সমস্যা হতে পারে। সে কখনো কোনো কারণে অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে পারে। কোনো ছোটখাটো বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করতে পারে। প্রথম প্রথম তার ছেড়ে আসা বাড়ির জন্য, বাবা-মায়ের জন্য কিংবা সে যে ঘরটাতে থাকত সেই ঘরটার জন্যও তার মন খারাপ লাগতে পারে।

এই পরিবেশ-পরিস্থিতিকে স্বামী ও তার পরিবারের সদস্যদের মানিয়ে নিতে হয়। মানিয়ে নেওয়ার দায় অবশ্য মেয়েটার ওপরই চাপে বেশি। যদিও এ দায় মেয়ের থেকে ছেলের পরিবারেরই বেশি হওয়া প্রয়োজন। অনেক পরিবার আছে যেখানে পরিবার সদস্যরা নতুন বউ হয়ে আসা মেয়েটার দোষ-ত্রুটি অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। মেয়েটা হয়ত কথা না বোঝা বা অভ্যস্ত না থাকার কারণে প্রথমদিকে অনেক কাজ করতে অপারগ হয়। আবার নতুন পরিবেশে অনেকে দ্রুত সহজও হতে পারে না। এজন্য সংসারের সবার কাছে মেয়েটাকে গালমন্দ শুনতে হয়। এই অবস্থায় মেয়েটার স্বামী অর্থাৎ ছেলেটা যদি মেয়েটাকে সহযোগিতা না করে তাহলে শ্বশুরবাড়িটাকে বুঝে উঠতে মেয়েটার অনেক সময় লেগে যেতে পারে। তাই মেয়েটাকে সঙ্গ দিতে হবে ছেলেটাকে। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে সে একা নয়। স্বামী হিসেবে সবসময় সে আছে তার পাশে। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে সাহায্য না করে পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে মিলে স্ত্রীর প্রতি অসদাচরণ করে তাহলে প্রায়ই সংকট আরো ঘনীভূত হয়। এ বিষয়ে একটু হলেও স্বামীকে ভাবতে হবে।

এখানে আরো একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার জন্য শুধু শ্বশুরবাড়ির সদস্যরাই নয় বরং বাবার বাড়ির সদস্যদেরও মেয়েটাকে সাহায্য করা প্রয়োজন। কারণ জন্ম থেকে মেয়েটা তাদের কাছে বড়ো হয়েছে বলে তারাই মেয়েটাকে ভালো করে বুঝতে পারে। সম্প্রতি অনলাইনে একটা গল্প পড়লাম— 'একটা মেয়ের বিয়ে হয়েছে। শ্বশুরবাড়ি থেকে বাড়ি এলে মা জিজ্ঞেস করল, ওরা কেমন? মেয়েটা উত্তর দিলো, ভালো নয়। পরদিন মেয়েটার মা একপাত্র ফুটন্ত পানির মধ্যে একটা গাজর, একটা ডিম, আর কফি-বীজ দিয়ে সিদ্ধ করল। তারপর মেয়েটাকে দেখাল। বলল, কী দেখলে? মেয়েটা বলল, তুমি গাজর, ডিম, কফি-বীজ একটা পাত্রে সিদ্ধ করলে। তখন মেয়েটাকে তার মা বলল, এটা চর্মচক্ষে দেখলে! আসল কথা হলো পাত্রের পানির ভেতর শক্ত গাজর দিলে সিদ্ধ হয়ে নরম হলো, আবার নরম ডিম সিদ্ধ হয়ে শক্ত হয়েছে এমন যে সহজে ভেঙে ফেলা যায়। আর কফি-বীজ পানির সঙ্গে মিশে একটা সুগন্ধী সৃষ্টি করেছে। এই গল্পটায় বোঝানো হয়েছে শক্ত হয়ে থাকলে শ্বশুরবাড়িতে মেয়েটি টিকতে পারবে না অর্থাৎ সংসার টিকবে না। নরম হলে অত্যাচার করতে করতে তার মেরুদণ্ড ভেঙে দেবে। আর কফি-বীজের মতো মিশে গেলে সুগন্ধী পরিবেশ পাবে।

বাঙালি সমাজে মেয়েদের মিশে যেতে হয়। অনেকে মিশে গিয়ে ভালো থাকে কেউ-বা থাকে না। তার ইচ্ছা বিসর্জন দিতে হয়। ইচ্ছা যদি বিসর্জন না দেয় তাহলে কখনো কখনো সংসারে ঝড় উঠতে পারে। মেয়েটাকে মনে রাখতে হবে নিজের অধিকার নিজের স্বাধীনতা নিয়েই চলতে হবে কিন্তু সংসারে ঝড় তুলে নয়। স্বামীকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তার বাড়ির সদস্যদের কথা শুনতে হবে কিন্তু স্ত্রীকে কষ্ট দিয়ে নয়। এতে সংসারে অশান্তি বাড়ে। আর এই অশান্তিতে কষ্টে পড়ে নতুন প্রজন্ম। নতুন প্রজন্মকে ভালো রাখতে হলে অবশ্যই সমঝোতা করে চলা উচিত। সংসারের ঝড় ঠেকাতে নারীর থেকে পুরুষের কষ্টটাই বেশি হয়। কারণ এজন্য তাকে তার নিজের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও মানিয়ে চলতে হয় আবার স্ত্রীর সঙ্গেও সমঝোতা করে চলতে হয়। সংসার ভালো রাখতে হলে নারী ও পুরুষের সমঝোতার খুবই প্রয়োজন।

সব পুরুষই তার নিজের নারীকে ভালোবাসে। ভালো রাখতে চায়। নিজের নারী বললাম এইজন্য যে বিয়ে হলে পুরুষের কাছে তার স্ত্রী নিজের নারী আবার নারীর কাছে তার স্বামী নিজের পুরুষ। উভয়ে

উভয়কে ভালোবাসে শ্রদ্ধা করে। স্বামী বা স্ত্রী যদি ভাবে, যাকে ভালোবাসি ইচ্ছা করে তাকে তাবিজ করে গলায় রাখি। এই কথার মধ্যে ভালোবাসা ধরলে ভালোবাসা আছে, আবার অন্যরকমভাবে বললে বন্দি করে রাখার প্রবণতাও আছে। ভাবখানা এমন, যদি হারিয়ে যায়! এই অবস্থায় অনেক সময় ভালোবাসা আনন্দমুখর না থেকে বরং হারিয়ে গিয়ে তাণ্ডবমুখর হয়ে যায়। সংসার কারো কাছে আনন্দবিলাস, কারো কাছে দুঃখবিলাস। কারো কারো কাছে সং সেজে শুধু সংসার করতে হয় বলে তাই করে যাওয়া। কারো কাছে গুরুত্ব পায় বিচার বিবেচনা করে সংসারধর্ম পালন করার বিষয়টি। তবে এটা ঠিক যে সংসারকে তাণ্ডবমুখর না করে আনন্দময় করে তোলা প্রয়োজন। প্রয়োজন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। তাই দুইয়ের মধ্যে সমঝোতা করে নেওয়া প্রয়োজন। সংসার শুধু একজনের জন্য সুখের হয় না, সংসার সুখের করতে পরিবারের সকল সদস্যের যার যেমন দরকার তার তেমনই সমঝোতা করা প্রয়োজন। পরিবারে বাস করে নারী ও পুরুষ। নারী-পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক।

শুধু পুরুষতান্ত্রিকতার জন্যই নয়, নারী আন্দোলনের ফলেও পরিবারের মধ্যে বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছে। দাদা, বাবা, ভাই এক গ্রুপ আর দাদি, মা, বোন এক গ্রুপ। কখনো কখনো দাদি চলে যায় তার স্বামী বা ছেলের গ্রুপে। একা পড়ে যায় মা। কিন্তু সত্যিই কি এরা আলাদা? আলাদা নয়। অতি সূক্ষ্মভাবে এই বিভাজন সৃষ্টি করা হয়েছে। পরিবারের এই বিভাজনের ফলেই সামাজিক বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছে। নারী স্বাধীনতা চাই, কিন্তু এর মানে যা খুশি তাই করা নয়। পরিবারের মধ্যে সমাজ-রাষ্ট্রের মধ্যে একজন নারীর স্বাধীনতা তার মত প্রকাশের স্বাধীনতা, তার মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি।

সংসার বা পরিবার শুধু স্বামী-স্ত্রী-ছেলেমেয়ে নিয়েই নয়। পরিবারের মধ্যে শ্বশুর-শাশুড়ি ছাড়াও থাকে অন্যান্য সদস্য। সমাজবদ্ধ বলে পরিবারের সদস্য ছাড়াও পাড়াপ্রতিবেশীসহ আশপাশের পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও মানুষের আচরণ অনেক সময় অনেক পরিবারকে ক্ষতবিক্ষত করতে পারে। এই ক্ষতবিক্ষত অবস্থা থেকেই টানাপোড়েন সৃষ্টি হতে পারে। কখনো টানাপোড়ন সৃষ্টি হতে পারে সন্দেহ থেকে। এই টানাপোড়েন কখনো কখনো দীর্ঘ হয় কখনো-বা সম্পর্কই শেষ হয়ে যায়। কখনো কখনো থেমে গেলেও তার রেশ থেকে যায়। বর্তমানে পরিবার ছোট হতে হতে বিন্দুতে এসে ঠেকেছে। টানাপোড়েন শুরু হলে কারো কাছে সে কথা বলার মতো মানুষ থাকে না। পরিবারের দুজন মানুষ গোমড়ামুখো হয়ে থাকে। এর ফল কখনো ভালো হয় কখনো হয় না। মানুষের ধর্ম টানাপোড়েন মিটানোর জন্য মধ্যস্থতা। মধ্যস্থ একজন থাকলে মিটমাট হওয়া সম্ভব। তবে তাকে হতে হবে ভালো একজন। সে যেন উভয়ের ভালো চায়। বিন্দু পরিবার হওয়াতে মধ্যস্থতার মানুষ পাওয়া দুষ্কর এখন। এর জন্য কখনো কখনো বন্ধুদের কাছে কিংবা অন্য কোনো কনসালটেন্টের কাছে ছুটতে হয়। বর্তমানে ভালো বন্ধু পাওয়াও চাট্টিখানি কথা নয়। তাই সংসারের ঝড় বেড়েই চলে। আর অসহায় হয়ে পড়ে নতুন প্রজন্ম অর্থাৎ শিশুরা। কখনো কখনো সংসারের এই ঝড়ের কারণে মারাও যাচ্ছে শিশুরা। কিন্তু ওদের দোষ কোথায়? কেন আজ বাবা-মা সন্তানের আপনজন হয়েও তাদের নিরাপত্তা দিতে পারছে না? কেন মায়ের বুকের কাছেও নিরাপদ নয় সে? কেন বাবার কাঁধে চড়তে নিরাপদ বোধ করে না সন্তান?

বাইরে তো নয়ই, আজ শিশুরা নিজেদের পরিবারের মধ্যেও নিরাপদ নয়। এই ঝড়ের তাণ্ডবে মারা না গেলেও কখনো বাবা ছাড়া মায়ের কাছে, কখনো-বা মা ছাড়া বাবার কাছে বড়ো হতে হচ্ছে শিশুকে। একাকী বড়ো হতে গিয়ে শিশুরা জীবন সম্পর্কে বিতৃষ্ণ ও অনীহ হয়ে পড়ছে। কখনো কখনো বাবা

মায়ের টানাপোড়েনের জন্য শিশুরা অপরাধ জগতে পা রাখছে। নারীর ওপর নির্যাতন আগামী প্রজন্মের কথা ভেবেই বন্ধ করতে হবে। তার জন্য পারিবারিক বন্ডিং এবং সচেতনতা অবশ্য প্রয়োজন। স্বামী তার স্ত্রীর সঙ্গে যে ব্যবহার করবে তাদের ছেলেমেয়ে সেই ব্যবহার শিখবে। বংশপরম্পরায় তাই চলে আসবে। সেজন্য পরিবারকেই সচেতন হতে হবে।

মানুষের মধ্যে মানবিকতা ও পাশবিকতা পাশাপাশি বাস করে। পাশবিকতার বৃদ্ধিতে মানুষ পাষণ্ড হয়ে ওঠে। নারী দুর্বল তাই নারীর ওপর অত্যাচার। সবল দুর্বলের প্রকৃতি লক্ষ করলে দেখা যাবে যে সমস্ত বিশ্বেই চলছে দুর্বলের ওপর অত্যাচার। তাই নারীকে নারী না ভেবে মানুষ ভাবলে অনেক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। আইনি শাসনও বলবৎ থাকবে। সঠিক বিচারও পাবে নারী। সবল আর দুর্বল হিসেবে যদি দেখা হয় তো দেখা যাবে, যে সংসারের পুরুষটি দুর্বল সেই সংসারে নারী দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে পুরুষ। শারীরিকভাবে না হলেও মানসিকভাবে এটা হতে পারে। শারীরিক অত্যাচার মানসিক অত্যাচার দুটোই সমান অপরাধ। নারী-পুরুষ বিভাজনের ফলে নারী নির্যাতন কমছে না বরং বাড়ছে।

২০১৫ সালে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'অরেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড : ইউনাইট টু এন্ড ভায়োলেন্স অ্যাগেইস্ট উইমেন অ্যান্ড গার্লস'। বাংলায়নে দাঁড়ায় 'বিশ্বকে কমলায় রাঙাও : নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে এক হও'। প্রতিরোধ পক্ষের কার্যক্রম ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত নানা কর্মসূচিতে বিস্তৃত করা হয়। ১৯৯১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের উইমেন গ্লোবাল লিডারশিপ ইনস্টিটিউট ২৫ নভেম্বরকে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। পরবর্তী সময়ে ১৯৯৩ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলেনে ২৫ নভেম্বরকে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এখন প্রশ্ন থেকে যায় মনে যে, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস কেন? দুর্বলের প্রতি অত্যাচার প্রতিরোধ দিবস কেন নয়? নারী কি আলাদা পৃথিবীর আলাদা কোনো জীব? নারী কেন নারী? মানুষ কেন নয়?

নারী নির্যাতন বাড়ার কারণ খুঁজলে নিচের কারণগুলো পাওয়া যাবে :

১. নারীকে মানুষ না বলে নারী করে রাখা;
২. নারীকে সম্পদের সমান অংশীদারিত্ব না দেওয়া;
৩. নারীর মতামতকে মূল্য না দেওয়া;
৪. নারীর অবমূল্যায়ন করা;
৫. নারীর ক্ষমতাকে গুরুত্ব না দেওয়া;
৬. সতীত্ব রক্ষার দায় নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া;
৭. সাংসারিক কাজ একা নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া এবং এটা বলা যে সংসারের কাজ কোনো কাজই না;
৮. উপার্জনের অসমতা;
৯. নারীর শারীরিক দুর্বলতা।

যেদিন এ পৃথিবী ভাবতে পারবে নারী মানুষ, যেদিন পুরুষ ভাবতে পারবে নারী একজন মানুষ, যেদিন নারী নিজে ভাবতে পারবে সে একজন মানুষ, আশা করা যায় সেদিন নির্যাতন কমবে। সেদিন আলাদা করে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস বা নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালন করতে হবে না। সেদিন

কমলা রং নারীর প্রতি নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের প্রতীক না হয়ে হবে দুর্বলের প্রতি নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের প্রতীক।

উপসংহারে বলা যায়, একজন নারী যেমন পুরুষ ছাড়া চলতে পারে না, তেমনি একজন পুরুষও নারী ছাড়া অচল। উভয়ের প্রেম-ভালোবাসায় এ প্রকৃতি বহমান। তাই শুধু ঝগড়া নয়, নয় কোন্দল মারামারি। সম্মান ও ভালোবাসার সম্মিলনে গড়ে উঠুক সংসার। মানুষ মানুষের জন্য, একে অপরের জন্য হোক মানুষ। সুন্দর হোক পৃথিবী।

আফরোজা অদিতি লেখক। afrozaaditi1953@gmail.com